অঙ্কনা বেতাল

‘সহজ পাঠ’ : কয়েকটি ছিন্ন ভাবনার সূত্র

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২৭ বৈশাখ (১০মে, ১৯৩০ খ্রিঃ) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে একত্রে প্রকাশিত হল ‘সহজ পাঠ’ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ততদিনে প্রায় তিরিশ বছর স্কুল চালিয়ে ফেলেছেন রবীন্দ্রনাথ। মূলত আশ্রম বিদ্যালয়ের ছেলেদের প্রয়োজনেই এর আগে তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় একাধিক প্রাইমার লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রাইমার রচনার শুরু ‘সংস্কৃত শিক্ষা’ দিয়ে—সময়টা ১৮৯৬ খ্রিঃ। তখনও শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়নি। ‘রবীন্দ্রজীবনী’-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন নিজের সন্তানদের সহজে সংস্কৃত শেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘সংস্কৃত শিক্ষা’ লেখেন[১]। ‘সংস্কৃত শিক্ষা’-র দুটি ভাগ লিখতে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই আরম্ভ। এরপর রবীন্দ্রনাথ লিখবেন ‘ইংরাজি-সোপান’ (১৯০৪), ‘ইংরাজি-পাঠ’ (১৯০৯), ‘ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা’ (১৯০৯?), ‘ইংরেজি-সহজশিক্ষা’ (প্রথম ভাগ ১৯২৯, দ্বিতীয় ভাগ ১৯৩০) এবং সবশেষে ‘সহজ পাঠ’ (দুই ভাগ, ১৯৩০)।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রাইমারগুলির মধ্যে ‘সহজ পাঠ’ নির্বিকল্পভাবে শ্রেষ্ঠ। ‘নন্দলাল বসু-কর্তৃক চিত্রভূষিত’[২] ‘সহজ পাঠ’ শিশুর কাছে একাধারে উন্মোচন করে ছবি আর শব্দের জগৎ। এই ছবি শুধু আঁকা ছবি নয়, রবীন্দ্রনাথের লিখনও শিশুর মনে ছবি আঁকতে থাকে। এবং ছবি শুধু মনেই আঁকেন না রবীন্দ্রনাথ, ছবি আঁকা হয় কানেও আর তার রেশ চলতে থাকে সারাজীবন।

ঘন মেঘ বলে ঋ

প্রথমেই বলে রাখা ভালো ‘সহজ পাঠ’ প্রচলিত অর্থে বর্ণশিক্ষারই বই নয়। ‘সহজ পাঠ’ প্রথম ভাগের আখ্যাপত্রে স্পষ্টতই জানানো হয়েছে, ‘এই বই বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়’[৩]। বর্ণ চিনতে শিখে যাওয়া শিশুর কাছে শ্রুতিগ্রাহ্য ‘পাঠ’ হাজির করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অ-আ-ক-খ যতখানি বর্ণ, তার চেয়ে বেশি ধ্বনি। বিশ্বভারতী ছাত্র সম্মিলনী ‘সপ্তপর্ণী’ পত্রিকায় হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, ‘...ধ্বনিকে প্রবলভাবে আশ্রয় করে তাঁর পাঠগুলি বর্ণপরিচয় ও পাঠ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।’[৪]

একই সঙ্গে ধ্বনি ও বর্ণ চেনাবার জন্য দু-লাইনের মিলযুক্ত পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন

রবীন্দ্রনাথ। পঙ্‌ক্তিগুলি শিশুর কানে ধ্বন্যুক্তিময় (Onomatopoeic) রেশ রেখে যায়। যেমন—

'ঘন মেঘ বলে ঋ

দিন বড়ো বিশ্রী।'[৫]

এখানে 'ঘ' ধ্বনির অনুপ্রাস মেঘগর্জনের, 'ঋ' মেঘে মেঘে ঘষা লেগে বজ্রপাতের আর 'শ্রী' ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি নামার শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'শ্রী' শুধুই 'ঋ-র সঙ্গে অনিবার্য ও একমাত্র মিল[৬] নয়, বাদল দিনের পুরো আবহটা ধরা আছে 'ঋ' স্বর-ধ্বনিকে চেনানোর এই দু-লাইনের প্রয়াসে।

তেমনি,

'ট ঠ ড ঢ করে গোল

কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল।'[৭]

সজাগ কানে শুনলে বোঝা যাবে 'ট ঠ ড ঢ' আসলে ঢাকে কাঠি পড়ার আওয়াজ।

'শ ষ স বাদল দিনে

ঘরে যায় ছাতা কিনে।

এখানেও 'শ ষ স' তিনটি শিস্‌ধ্বনির পাশাপাশি অবস্থান শন্‌শনিয়ে আর্দ্রবায়ুর বয়ে যাওয়াকেই মনে উস্‌কে দেয়।

'শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ

কোণে বসে কাশে খ ক্ষ।'[৯]

'হ ক্ষ' এবং 'খ ক্ষ' আসলে কাশিরই শব্দ। Onomatopoeia-র এমন ঐশ্বর্য বাংলা প্রাইমারে বিরল।

'সহজ পাঠ' দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাঠে শিশুদের যথাক্রমে 'রেফ' এবং 'র-ফলা'-র প্রয়োগ শেখানো হয়েছে। লক্ষ করতে হবে দুটিতেই রয়েছে বর্ষার আবহ।

প্রথমটিতে : 'বর্ষা নেমেছে। গর্মি আর নেই। থেকে থেকে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমকানি চলছে'।[১০]

দ্বিতীয়টিতে : 'দিনটা বড়ো বিশ্রী। শুনছ বজ্রের শব্দে? শ্রাবণ মাসের বাদ্‌লা। উস্রিতে বান ডেকেছে।'[১১]

টেকস্‌টের আবহনির্মাণে ধ্বনির ইশারাকে ব্যবহার করতে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা ভার।

সমীরচন্দ্র মজুমদারের সংগ্রহভুক্ত একটি খাতা থেকে জানা যায় ১৯৩০-এ প্রকাশিত হলেও 'সহজ পাঠ'-এর প্রাথমিক পরিকল্পনা হয়েছিল ১৮৯০-এর দশকেই। এই খসড়ায় রবীন্দ্রনাথের বর্ণ চেনাবার প্রয়াস এই রকম—

'ক কাটে কাঠ।
খ খায় খই।
গ গায় গান।
ঘ ঘুমোয় ঘরে।'[১২] ইত্যাদি।

স্পষ্টতই বর্ণ-পরিচয়ের এই প্রচেষ্টা উচ্চারণের পক্ষে অসুবিধাজনক ও শ্রুতিকটু। তিন দশক বাদে রবীন্দ্রনাথ এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছেন, কিন্তু খসড়াটির ঐতিহাসিক মূল্য নানাদিক থেকে অপরিসীম।

এই খসড়ার লিখনকাল '১৩০২-০৩ বঙ্গাব্দের কোনো'[১৩] সময়। তখন রবীন্দ্রনাথের জীবনে চলছে শিলাইদহ পর্ব। পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা ১৯৩০-এর 'সহজ পাঠ'-এও ছাপ রেখে যাবে।

আজ বুধবার, ছুটি

সহজ পাঠ'-এর প্রথম ভাগের দশটি পাঠ দশটি করে গদ্য ও পদ্যের সমাহার। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে মোট তেরোটি গদ্য ও আটটি পদ্য। দ্বিতীয় ভাগে গদ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই পক্ষপাতিত্ব আপাতত আমাদের বিবেচ্য নয়, আমরা এখন ঘুরে নেব 'সহজ পাঠ'-এর ভৌগোলিক মানচিত্রে।

'সহজ পাঠ'-এর এলাকা বিস্তৃত চন্দননগর থেকে শিলং পর্যন্ত; বিপ্রগ্রাম, নন্দগ্রাম, বন্দীপুরের বন, গুপ্তিপাড়া, স্বর্ণগঞ্জ থেকে বিষ্ণুপুর, চন্দনী গাঁ, শল্যপুর, অহল্যাপাড়া পর্যন্ত; নগর কলকাতা থেকে দিল্লি-আগ্রা-লাহোর-বোম্বাই পর্যন্ত। শুধু 'আমাদের ছোটো নদী'-ই নয়, পদ্মা, কর্ণফুলি, তিস্তা, আত্রাই, 'ইচ্ছামতী', 'অঞ্জনা'-ও নদীভাসিত বাংলার পটভূমিতে নিজের নিজের চরিত্র নিয়ে উপস্থিত। বাদ পড়ে না 'তিল্পনি খাল' বা 'মোতিবিল'-ও। অধিকাংশ পাঠই বাদল দিন কিংবা 'বৃষ্টিবাদল' কেটে যাওয়ার আর শরতের আগমনীর খবর দেয়। নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয় বৈশাখ-ফাল্গুন শীত-গ্রীষ্মও। ফিকে হয় না কোনো কোনো জায়গার আঞ্চলিক রঙও।

যেমন, প্রথম ভাগের পঞ্চম পাঠের গদ্যাংশটির ('চুপ করে বসে ঘুম পায়। চলো, ঘুরে আসি।') একটি বাক্য—'আজ বুধবার, ছুটি।'[১৪]

বুধবারে ছুটির প্রসঙ্গটিই জানিয়ে দেয় জায়গাটি বোলপুরে। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় এবং ১৯২১-এর পর থেকে বিশ্বভারতীতেও বুধবারই প্রার্থনা ও ছুটির দিন।

রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের মানুষেরাও আত্মগোপন করে আছেন 'সহজ পাঠ'-এর চরিত্রদের ভিড়ে।[১৫] 'ক্ষিতিবাবু' (দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় পাঠ'), 'দীনবন্ধু' (দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ পাঠ'), 'বোষ্টমী' (দ্বিতীয় ভাগ, নবম পাঠ'), 'রেভারেণ্ড এণ্ডারসন' (দ্বিতীয় ভাগ, দশম পাঠ') নামগুলি নিছক আপতিক কিনা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। আমাদের ভুললে চলবে না প্রথম ভাগ চতুর্থ পাঠের 'রানীদিদি'-র কাশির কথাও। ১৯০৭ থেকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে বাস করতে শুরু করেন ক্ষিতিমোহন সেন এবং ১৯১২-র জুন মাসে লন্ডনে চার্লস ফ্রিয়র এন্ডরুজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ। ১৯১৩-র পর থেকে বারে বারে শান্তিনিকেতনে এসেছেন 'দীনবন্ধু' এন্ডরুজ। অংশগ্রহণ করেছেন শান্তিনিকেতনের কাজে। তাই 'সহজপাঠ'-এ 'ক্ষিতিবাবুর ক্ষেতে একটি ঘাস নেই'[১৬] কিংবা 'দীনবন্ধুকে রেখো পাশের ঘরেই'[১৭]—বাক্যগুলি হয়তো নেহাতই আকস্মিক নয়। মেজ মেয়ে রেণুকা বা রানীর দীর্ঘ অসুস্থতার কথাও আমাদের জানা। সেখান থেকেই 'রানীদিদি যায় না। রানীদিদি ঘরে। তার যে তিন দিন কাশি।'[১৮]—কথাগুলি অন্যতর তাৎপর্য লাভ করে। ততদিনে অবশ্য রানী বেঁচে নেই।

১৯১২-তে শিলাইদহে সর্বখেপি বোষ্টমীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয়। এই আলাপের ফল ১৩২১-এর আষাঢ়ে 'সবুজ পত্র'-এর 'বোষ্টমী' গল্পটি। এই বোষ্টমীর প্রসঙ্গ আরও একাধিক বার এসেছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ও চিঠিপত্রে।[১৯] খঞ্জনি-বাজানো সেই বোষ্টমীর আবির্ভাব ঘটেছে 'সহজ পাঠ'-এও—'বোষ্টমী গান গাইতে এসেছে। ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না।'[২০]

১৯১২-তে লন্ডনে জে ডি এন্ডারসনের সঙ্গে পরিচিত হন রবীন্দ্রনাথ। এন্ডারসন দীর্ঘকাল ভারতে সিভিলিয়ন হিসেবে কাটিয়েছেন। চট্টগ্রাম প্রদেশে থাকার সুবাদে তিনি বাংলা ভাষা ভালোই জানতেন এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোককথার একটি সংকলনও প্রকাশ করেন। বিলেতে ফিরে গিয়ে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'ছন্দ' বিষয়ে মতামত জানিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতেন। তাঁর লেখা ৪৫টি চিঠি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।[২১] এখান থেকেই হয়তো 'সহজ পাঠ'-এ 'এণ্ডারসন' নামটির অনুপ্রবেশ। তবে 'রেভারেণ্ড' শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন বলা শক্ত। সম্ভবত দুটি 'ণ্ড'-এর (তখনকার বানানে 'ণ্ড') প্রয়োগ শেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কারণ প্রাইমারের বৈশিষ্ট্যই পৌনঃপুনিকতা।

আর একটি সংযোজন। প্রথম ভাগের ষষ্ঠ পাঠের 'বংশী সেন' পাণ্ডুলিপি পাঠে ছিলেন 'বশী সেন'[২২]। প্রাইমারের পাঠসজ্জার নিজস্ব যুক্তিক্রমে 'বশী সেন' হওয়াই সংগত। কারণ রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় ভাগ শুরু করছেন অনুস্বার-সম্বলিত শব্দের প্রয়োগ দিয়ে। 'বশী সেন' নামটি রবীন্দ্রনাথের চেনাও বটে।[২৩] কৃষিবিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন ওরফে বশী সেন

(১৮৮৭-১৯৭০) প্রথম জীবনে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসুর সহকারী। পরে তিনি কলকাতা ও আলমোড়ায় বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন। বশী সেনের স্ত্রী গারট্যুড এমারসন ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক এমারসনের বংশের কন্যা। রবীন্দ্রনাথ এঁর সঙ্গে পত্রবিনিময়ও করেছেন। ১৯৩৭-এ 'বিশ্বপরিচয়' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ বশী সেনের সহযোগিতা পেয়েছিলেন।[২৪] পরে মুদ্রিত 'সহজ পাঠ'-এ নামটি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বাস্তব মানুষ যেমন অ-বাস্তব চরিত্রদের সঙ্গে মিশে আছে 'সহজ পাঠ'-এ, তেমনি একাধিক স্থান-কাল মিলেমিশে একটাই রূপ ধারণ করে আছে 'সহজ পাঠ'-এ। তাদের চিনে নেওয়ার সূত্রগুলো চোখের সামনেই আছে, অথচ তারা কী বিস্ময়করভাবে অচেনা।

আষাঢ়ে বাদল নামে

'সহজ পাঠ'-এর ভূগোল-ভাবনায় একাকার হয়ে আছে পূর্ববঙ্গ আর শান্তিনিকেতন। কখনো কখনো তারা সমাপতিতও হয়েছে। যেমন প্রশ্ন জাগতে পারে, 'আমাদের ছোটো নদী' আসলে কোন নদী? বৈশাখ মাসে 'হাঁটুজল' আর আষাঢ়ে
ভর-ভর' এই জীবন-সম্পৃক্ত নদীর নাম কী?

'পুনশ্চ'-র 'কোপাই' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন কোপাইয়ের ভাষা 'গৃহস্থপাড়ার ভাষা'। তার 'এ পারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে'। 'বেঁকে বেঁকে-চলা কোপাই 'পথিককে দেয় পথ ছেড়ে'। 'বাঁকে বাঁকে' চলা 'ছোটো নদী'-ও বসতিলগ্ন। 'হাঁটুজল' শব্দটিই বুঝিয়ে দেয় বৈশাখে পায়ে হেঁটে পদী পারাপারের সম্ভাব্যতার কথা। বর্ষায় অবশ্য নদীর এই শান্ত চেহারা পালটে যায়। কোপাই নদী—

'ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।'[২৫]

আর 'সহজ পাঠ'-এ দেখি—

'আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভর-ভর—
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,
ঘোলা জলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে।'[২৬]

'মাতিয়া ছুটিয়া'-চলা 'ছোটো নদী'-র 'ধারা খরতর' আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'সোনার তরী' কবিতার 'ভরা নদী ক্ষুরধারা/খরপরশা'[২৭] -কে। কোপাইয়ের দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের মনে উসকে দিয়েছে পদ্মার স্মৃতি। প্রত্যক্ষ কোপাই আর স্মৃতির পদ্মা মিশে গড়ে উঠেছে 'আমাদের ছোটো নদী'।

শিলাইদহে পদ্মাতীরের অভিজ্ঞতা 'সহজ পাঠ'-এর অন্যত্রও রয়েছে। আমরা স্মরণ করতে পারি 'মোতিবিল'-এর বর্ণনা—

'হেথা হোথা ডাঙা জাগে, ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা চলে আঁকাবাঁকা।
কোথাও বা ধানখেত জলে আধো ডোবা,
তারি 'পরে রোদ পড়ে, কিবা তার শোভা।
ডিঙি চড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারি গান।'[২৮]

জেলেডিঙিতে গান-গাওয়ার প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি বর্ণমালার ছড়াতেও

'ক খ গ ঘ গান গেয়ে

জেলে-ডিঙি চলে বেয়ে।'[২৯]

নদীর চরে জীবন-নির্বাহও দৃষ্টি এড়ায়নি তাঁর

'চরে বসে রাঁধে ঙ

চোখে তার লাগে ধোঁয়া।'[৩০]

পূর্ববঙ্গে নদীর চরে ধানচাষ ও জেলেডিঙিতে মাঝির গান 'ছিন্নপত্র'-এর পাঠকমাত্রেরই জানা। 'সহজ পাঠ' আর 'ছিন্নপত্র'-কে যদি আমরা পরিপূরকতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারি তাহলে 'সহজ পাঠ'-এর হয়ে-ওঠাকে বুঝতে পারা যাবে।

শীতের বনে কোন সে কঠিন

দুই ভাগ 'সহজ পাঠ' জুড়ে বর্ষা ঋতুর জয়জয়কার। বৃষ্টি-বাদল কেটে শরতও দেখা দিয়ে গেছে কয়েক বার। কিন্তু শীতের আবহ সরাসরি একটিমাত্র পাঠে—

'চুপ করে বসে ঘুম পায়। চলো, ঘুরে আসি। ফুল তুলে আনি।

আজ খুব শীত। কচুপাতা থেকে টুপ্ টুপ্ করে হিম পড়ে।'[৩১]

এই রচনাটিতে 'আজ বুধবার, ছুটি'-র সূত্রে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি জায়গাটি শান্তিনিকেতন। রচনাটির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

'বেলা হল। মাঠ ধূ ধূ করে। থেকে থেকে হু হু হাওয়া বয়। দূরে ধুলো ওড়ে। চুনী মালী কুয়ো থেকে জল তোলে আর ঘুঘু ডাকে ঘূ ঘূ।'[৩২]

এই সূত্রে ৩১ অক্টোবর ১৮৯৫-তে বোলপুর থেকে লেখা 'ছিন্নপত্র'-এর একটি চিঠি মনে পড়ে যায়—

'প্রথম শীতের আরম্ভে সমস্ত দিন ধরে যে একটা উত্তরে বাতাস দিতে থাকে সেইটে আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে। বাতাসটা হীহী করতে করতে আসছে। আমার আমলকী-তরুশ্রেণীর পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এখানকার বনরাজ্যের মধ্যে যেন খাজনাআদায়ের পেয়াদা এসেছে—সমস্ত কাঁপছে ঝরছে এবং দীর্ঘনিশ্বাসে আকুলিত হয়ে উঠেছে। দুপুর বেলাকার রৌদ্রক্লান্ত বিশ্রামপূর্ণ বৈরাগ্যে, ঘন আম্রশাখায় ঘুঘুর কূজনে, এই ছায়ালোকখচিত স্বপ্নাতুর প্রহরগুলোকে যেন বিরহবিধুর করে তুলেছে।'[৩৩]

১৯৩০-এর 'সহজ পাঠ'-এর হয়ে ওঠার পেছনে বোলপুরে ১৮৯৪-এর একটি আসন্ন শীতের দুপুর ও ঘুঘুর ডাক আমাদের ভুললে চলবে না। কারণ এই চিঠির প্রথমাংশ থেকেই গড়ে উঠবে 'সহজ পাঠ'-এর বিখ্যাত কবিতা—

'আমলকী-বন কাঁপে, যেন তার

বুক করে দুরু দুরু—

পেয়েছে খবর পাতা-খসানোর

সময় হয়েছে শুরু।'[৩৪]

এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে ১৯২৭-এ লেখা আর একটি রবীন্দ্রগান

'শীতের বনে কোন্ সে কঠিন আসবে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন বনের কোলে।

আমলকী-ডাল সাজল কাঙাল, খসিয়ে দিল পল্লবজাল

কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে।'[৩৫]

শীতের আগমনীর সঙ্গে আমলকী গাছের রিক্ততার একটা যোগ আছে। শরতের হিমের পরশ মেখে 'সহজ পাঠ'-এর আমলকী-বনও ঘোষণা করেছে শীতের আগমনবার্তা।

আর্মানি গির্জের কাছে আপিস

শুধুই শান্তিনিকেতন বা পূর্ববাংলা নয়, 'সহজ পাঠ'-এ ধরা পড়েছে শহর কলকাতার চালচিত্রও। দ্বিতীয় ভাগে অন্তত চারটি গদ্য-পদ্যে আছে নগরজীবনের প্রসঙ্গ। একাদশ পাঠের পদ্যে স্বপ্নে কলকাতার তুমুল গতি স্তব্ধ হয়ে যায় স্বপ্নভঙ্গে—কলকাতা থাকে কলকাতাতেই। নগরই ভাঙে স্বপ্নকে।

লঙ্কা-ছাড়া ঝোল খাওয়া অফিস-তাড়িত অসুস্থ গৃহস্থটিকে ভুলে গেলেও আমাদের চলবে না। পদ্মার চরের ব্যাপ্তি শহরে নেই। বর্ষার বিপুল উদযাপন নাগরিক চাকুরিজীবীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তার মনের কথা—'সকালে রৌদ্র ছিল, নিশ্চিন্ত ছিলাম। দেখতে দেখতে বিস্তর মেঘ জমেছে। বাদ্‌লা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হলে বাঁচি।'[৩৬] তার যাবতীয় রোম্যান্টিকতা নিঃশেষিত হয়ে যায় মেঘ-রঙের বর্ণনাতেই—'পূর্ব দিকের মেঘ ইস্পাতের মতো কালো। পশ্চিম দিকের মেঘ ঘন নীল।'[৩৭] ব্যস্ত সকালে প্রথমেই তার মনে হয়—'আর্মানি গির্জের কাছে আপিস।'[৩৮]

শহরের কর্মব্যস্ত দুপুরের এক টুকরো ছবি ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় ভাগে সপ্তম পাঠের কবিতায়। এখানে শহরকে দেখার চোখ একজন রাজমিস্ত্রির যে প্রতিদিন সকালে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসে 'তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চড়ে'। তারপর—

'সকাল থেকে সারা দুপর

ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর

খেয়াল-মতো দেয়াল তুলি গড়ে।'[৩৯]

'দুঁপুর' নয়, 'দুপর'। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ইডিয়ম।[৪০] শুধু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শব্দ নয়, কবিতায় এরপর যুক্ত হয়ে যাবে রবীন্দ্রনাথের দেখার চোখও—

'বাসনওয়ালা থালা বাজায়;

সুর করে ঐ হাঁক দিয়ে যায়

আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া।

সাড়ে চারটে বেজে ওঠে

ছেলেরা সব বাসায় ছোটে

হো হো করে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।'[৪১]

'ছিন্নপত্রে'-এর ১৩০ নম্বর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন ফেরিওয়ালাদের হাঁক শুনে মন বিচলিত হওয়ার কথা।[৪২] মন বিচলনের হদিস আরও বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাবে 'ছেলেবেলা'-য়—

> 'বড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস-করা ডাক শোনা যায় কাঁচা-আমওয়ালার। বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলছে দূরের থেকে দূরে।...সাড়ে চারটার পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে।...
> ক্রমে দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে। শহরের পাঁচমিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের সুর লাগায় ইঁটকাঠের দৈত্যটার দেহে।'[৪৩]

'জীবনস্মৃতি'-র 'রাজার বাড়ি'-ও হাজির 'সহজ পাঠ'-এর সামিয়ানায়—

> 'চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই—
>
> তেপান্তরের মাঠ বুঝি ওই,
>
> মনে ভাবি ঐখানেতেই
>
> আছে রাজার বাড়ি।'[৪৪]

শিশুপাঠ্য রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভুলে যেতে পারেননি নিজের শৈশবকে। তাই 'সহজ পাঠ'-এর বিভিন্ন লেখায় ঢুকে পড়েছে টুকরো টুকরো 'ছেলেবেলা'।

পদ্মানদীর চরে রান্না চড়াতে হবে

ছোটোবেলায় রবীন্দ্রনাথ চাকরদের 'ছোটোকর্তা' শ্যামের মুখে শুনেছিলেন পূর্ববাংলার ডাকাতদের গল্প। ঠাকুরবাড়িতে একবার ডাকাতের খেলাও দেখানো হয়েছিল।[৪৫] কৈশোরে জ্যোতিদাদার সঙ্গে শিলাইদহে হাতির পিঠে চড়ে বাঘ শিকারে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল তাঁর।[৪৬] 'সহজ পাঠ'-এর ডাকাতের আর শিকারের গল্পও হয়তো তারই ফসল। আবদুল মাঝির কাছে শুনেছিলেন কাঁচি বেদেনির কথা—

> 'একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা।
> কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ঐ

দানোগিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে।'[৪৭]

পদ্মার কুমিরের এই গল্পকে রবীন্দ্রনাথ জুড়েছেন 'সহজ পাঠ'-এ বিশ্বম্ভরবাবু আর শম্ভুর গল্পে—

'আর একবার শম্ভু বিশ্বম্ভর-বাবুর সঙ্গে গিয়েছিল স্বর্ণগঞ্জে। সেখানে পদ্মানদীর চরে রান্না চড়াতে হবে। তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন। পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউ গাছের জঙ্গল। উনান ধরানো চাই। দা দিয়ে শম্ভু ঝাউডাল কেটে আঁটি বাঁধল। অসহ্য রৌদ্র। বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে। শম্ভু নদীতে জল খেতে গেল। এমন সময় দেখলে, একটা বাছুরকে ধরেছে কুমীরে। শম্ভু এক লম্ফে জলে প'ড়ে কুমীরের পিঠে চ'ড়ে বসল। দা দিয়ে তার গলায় পোঁচ দিতে লাগল। জল লাল হয়ে উঠল রক্তে। কুমীর যন্ত্রণায় বাছুরকে দিল ছেড়ে।'[৪৮]

'সহজ পাঠ'-এ শুধু যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে তা নয়, গল্প-শোনার পরোক্ষ অভিজ্ঞতাও কাজ করেছে। 'খাপছাড়া'-'সে'-'গল্পসল্প'-এর সমসাময়িক 'সহজ পাঠ'-এ ঢুকে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও ছেলেবেলা।

একদিন রাতে আমি

শিলাইদহ-পতিসর-কালিগ্রামে জমিদারি পরিচালনার নানা অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে 'সহজ পাঠ'-এর বিভিন্ন রচনায়। দ্বিতীয় ভাগের একাদশ পাঠে উদ্ধব মণ্ডলের কাহিনি, দ্বিতীয় পাঠে বিবাহ-অনুষ্ঠানে চাষিদের ভিড় করে আসা বা বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারের হাট রবীন্দ্রনাথের অদেখা নয়। এমনকি 'সহজ পাঠ'-এ যুক্ত হয়েছে তাঁর স্বপ্নের অভিজ্ঞতাও।

'একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু—

"চেয়ে দেখো" "চেয়ে দেখো" বলে যেন বিনু।

চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা-কড়িতে

কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।'[৪৯]

এর সঙ্গে তুলনীয় ১৮৯১-এর জুন মাসে দেখা একটি স্বপ্ন। এই স্বপ্নটি প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্র'—এর ২৯ নম্বর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'কাল রাত্রে ভারি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে—বাড়ি ঘর সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে—এবং তার ভিতর তুমুল কী একটা কাণ্ড চলছে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি করে পার্ক্ স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি—যেতে যেতে দেখলুম সেন্টজেভিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হু হু করে বেড়ে উঠছে—সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উঁচু হয়ে উঠছে।'[৫০]

স্বপ্নে ছিল কলকাতা শহরের উল্লম্ব গতি আর কবিতায় গতি অনুভূমিক। কবিতায় স্কুলের প্রসঙ্গ আছে আর এই চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার কলেজ ও পরের দিকে স্কুলের উল্লেখ করেছেন। গতিশীল কলকাতায় (তুলনীয় 'চলন্ত কলিকাতা'; 'চিত্রবিচিত্র')—

> 'আমাদের ইসকুল ছোটে হনহন,
>
> অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
>
> ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছটফট,
>
> পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট।' [৫১]

শৈশবে যিনি স্কুল-পালিয়েছেন, তাঁর প্রাইমারে অঙ্ক, ব্যাকরণ এবং ভূগোলের এমন অবস্থাই স্বাভাবিক। মানচিত্রে থাকে স্থাননির্দেশ। স্বপ্নে স্থানগুলো তাদের স্থাণুত্ব ত্যাগ করেছে। তাই কি 'ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছটফট'? বাস্তব জগতকে ভেঙে non-sensical করে দেওয়ার মধ্যে হয়তো এডওয়ার্ড লিয়ার কিংবা সুকুমার রায়ের প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু সবার ওপরে স্কুলপালানো শিশুমনস্তত্ত্ব নিয়ে জেগে থাকেন রবীন্দ্রনাথই।

আলোর অশোক ফুল

১২৯৯-এর পৌষে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> '...বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ পাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমনি করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না।'[৫২]

'কোনোমতে কাজ' চালানো নয়, 'সহজ পাঠ'-এ রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই জোর দিয়েছেন শিশুর আনন্দময় পাঠের দিকে। নিজের ছেলেবেলায় স্কুলের পরিবেশ এবং শাসনপ্রণালী সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ ধারণা ছিল তাঁর। সেই রকম শিক্ষা নয় তিনি চেয়েছিলেন 'বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা'।[৫৩] আমাদের মনে পড়বে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে লেখা 'তোতাকাহিনী'-র কথা। 'সহজ পাঠ'—এ পড়া কখনো নীতিবাগীশ উপযোগবাদী মুখস্তবিদ্যায় পর্যবসিত হয়নি। উনিশ শতকের শিশুপাঠ্যপুস্তক 'শিশুশিক্ষা' ও 'বর্ণপরিচয়'এ যেখানে 'পড়া'-ই মুখ্য ক্রিয়াপদ সেখানে 'সহজ পাঠ'-এ 'য র ল ব' ছাড়া 'একমনে পড়া'-র আর কোনো ছবি নেই। বরং সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় স্কুল-পালানো শিশুমনস্তত্ত্বকে—

'দুই হাত তুলে কাকা বলে থামো থামো—

যেতে হবে ইস্‌কুলে, এই বেলা নামো।

আমি বলি কাকা মিছে করো চেঁচামেচি,

আকাশেতে উঠে আমি মেঘ হয়ে গেছি।'[৫৪]

বাধ্যতামূলক শিক্ষার হাত থেকে শিশু পালিয়ে বাঁচতে চায়। সে স্বপ্নে উড়ে যায় পাখা মেলে। কারণ বাস্তব তার ইচ্ছার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। এই চরম সত্যকে শিশুপাঠ্য কবিতায় উচ্চারণ করেছেন পুস্তকপ্রণেতা। এখানেই অন্যান্য শিশুপাঠ্য পুস্তকের তুলনায় 'সহজ পাঠ'-এর অসামান্যতা।

এখানে একটা কূট প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এই কবিতায় যে পড়ুয়াটি স্বপ্ন দেখছে সে বালক না বালিকা? শিশুর লিঙ্গভেদ হয় না, কিন্তু যার স্বপ্ন—

'ফিরিব বাতাস বেয়ে রামধনু খুঁজি,

আলোর অশোক ফুল চুলে দেব গুঁজি।

সাত সাগরের পারে পারিজাত-বনে

জল দিতে চলে যাব আপনার মনে।'[৫৫]

—সে কি একটি শিশুকন্যা নয়? তাহলে রবীন্দ্রসাহিত্যে উৎকেন্দ্রিক মেয়েও আছে! 'সহজ পাঠ'-এর সব মেয়েই শুধু বিনি-বামিদের মতো ঘাটে বাসন মাজে আর রানীর মতো শুয়ে শুয়ে কাশে না, কেউ কেউ আকাশে মেঘও হতে চায়।[৫৬]

সত্যি, 'সহজ পাঠ' বড় সহজ বই নয়!

উৎস ও অনুষঙ্গ

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪৪৫
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', প্রথম ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, আখ্যাপত্র
৩। তদেব
৪। হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, 'সহজ পাঠ' প্রসঙ্গে'; অতনু শাসমল সম্পাদিত 'সপ্তপর্ণী', বিশ্বভারতী, বোলপুর, ১৯৮০-৮১, পৃ.-৪৯
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪
৬। বুদ্ধদেব বসু, 'বাংলা শিশুসাহিত্য', 'সাহিত্যচর্চা', দে'জ, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ-৬৯
৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', প্রথম ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ-১১
৮। তদেব, পৃ-১৮
৯। তদেব, পৃ-১৯
১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-১৫
১১। তদেব, পৃ-১৯
১২। কানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্রপ্রতিভা', ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি কলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৬৫-২৬৭
১৩। তদেব, পৃ-২৬৫
১৪। রবীন্দ্রনাথ ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৪
১৫। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ।
১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-১২
১৭। তদেব, পৃ-১৪
১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', প্রথম ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৯
১৯। তপোব্রত ঘোষ, 'রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের শিল্পরূপ', দে'জ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ-৩১৪-৩১৮
২০। রবীন্দ্রনাথা ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৭

২১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪৬৭-৬৮
২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০১, পৃ-১২৬১
২৩। এ বিষয়ে সচেতন করেন রামানুজ মুখোপাধ্যায়।
২৪। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : নিতাই নাগ, 'বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন', প্রণতি পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০০৯
২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ-৮
২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', প্রথম ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৬
২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ-৪৩৭
২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', প্রথম ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৭-২৮
২৯। তদেব, পৃ-৭
৩০। তদেব, পৃ-৮
৩১। তদেব, পৃ-৩৩
৩২। তদেব, পৃ-৩৪
৩৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-৩৭৭
৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', প্রথম ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৮
৩৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ-৫৭৩
৩৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৪-২৫
৩৭। তদেব
৩৮। তদেব
৩৯। তদেব, পৃ-২২
৪০। এই বিষয়টি বলেছিলেন অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ।
৪১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৩
৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-৩৭৮
৪৩। তদেব, পৃ-১০৭-১০৮
৪৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৯

৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-১০৪

৪৬। তদেব, পৃ-৯৮

৪৭। তদেব, পৃ-৯৯

৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪২

৪৯। তদেব, পৃ-৩৯

৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-৩১৫

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪০

৫২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ-৩১৪

৫৩। তদেব

৫৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সহজ পাঠ', প্রথম ভাগ, বিশ্বভারতী, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪৬

৫৫। তদেব।

৫৬। এই পর্যবেক্ষণটি একান্তভাবেই অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষের।